

মাটির জৈব পদার্থ ব্যবস্থাপনা

প্রাণী, গাছপালা ও লতাপাতা মাটির জৈব পদার্থের প্রধান উৎস। জৈব পদার্থমাটির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলীর উন্নয়ন করে এবং অণুজৈবিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি করে। জৈব পদার্থ মাটির গঠন উন্নয়ন করে, মাটি খুরঝুরে ও নরম করে। ফলেগাছের শিকড় সহজে মাটিতে প্রবেশ করতে পারে এবং মাটিতে বায়ু চলাচল বৃদ্ধি পায়। মাটির জৈব পদার্থকে জমির উর্বরতার চাবিকাঠি বলা যেতে পারে। মাটির যাবতীয় গুণাগুণ জৈব পদার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। জৈব পদার্থ ফসলের পুষ্টি উপাদান, প্রধানত নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও সালফার এর প্রধান উৎস। জৈব পদার্থকে উদ্ভিদ পুষ্টির ‘স্টোর হাউজ’ বা সংরক্ষণাগার এবং মাটির ‘জীবনী শক্তি’ বলা হয়। জৈব পদার্থ মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারকত্ব নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। এছাড়া জৈব পদার্থ মাটির উপকারী অণুজীবের ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধির মাধ্যমে মাটিতে বিদ্যমান খাদ্য উপাদানকে ফসলের গ্রহণ উপযোগী আকারে পরিবর্তন করতে সহায়তা করে।

একটি উর্বর কৃষি জমিতে শতকরা ২.০ ভাগ জৈব পদার্থ থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ জমিতে শতকরা ১.০ ভাগেরও কম জৈব পদার্থ রয়েছে। সাধারণতঃ উঁচু জমি ও বেলে মাটিতে তুলনামূলকভাবে জৈব পদার্থ কম থাকে এবং নিচু জমি ও আঠালো মাটিতে বেশি থাকে। মাটির জৈব পদার্থ অণুজৈবিক পঁচনের মাধ্যমে কমতে থাকে। অণুজৈবিক কার্যকলাপ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। উচ্চ তাপমাত্রায় মাটির অণুজৈবিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়, ফলে জৈব পদার্থ হ্রাস পায়। জমিতে দীর্ঘ দিন ধরেপানি জমে থাকলে মাটির জৈব পদার্থ কিছুটা বৃদ্ধি পায় কিন্তু জমি পর্যায়ক্রমিকভাবে ভিজা ও শুকনা অবস্থাতে পরিবর্তিত হতে থাকলে জৈব পদার্থ কিছুটা হ্রাস পায়। এ কারণে ধারাবাহিকভাবে ধান চাষের জমিতে বেশিরভাগ সময় পানি জমে থাকার কারণেমাটির জৈব পদার্থ কিছুটা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। অন্যদিকে ধান ও শুকনা জমির ফসল যেমন- গম, ভুট্টা, সবজি ইত্যাদি পর্যায়ক্রমিকভাবে চাষ করা হলে মাটির জৈব পদার্থ কিছুটা কমতে দেখা যায়। জমিতে নিয়মিত জৈব সার ব্যবহারের মাধ্যমে মাটির জৈব পদার্থ বজায় রাখা যায়।

মাটির জৈব পদার্থ পরিবর্তনশীল বিধায় এর দিকে সব সময় বিশেষভাবে নজর রাখা প্রয়োজন। জমির উর্বরতা রক্ষার জন্য নিয়মিতভাবে জৈব সার ব্যবহার করা প্রয়োজন। বিভিন্ন উৎস থেকে জৈব সার পাওয়া যেতে পারে, যার মধ্যে গোবর, মুরগীর বিষ্ঠা, খামারজাত সার (গবাদি পশুর মল মূত্র, মুরগীর বিষ্ঠা, খড়কুটা, সবজি ও ফসলের পরিত্যক্ত অংশ ইত্যাদি থেকে তৈরী সার), সবুজ সার অন্যতম। এছাড়া ফসল কর্তনের সময় সবজি ও ফসলের পরিত্যক্ত অংশ, খড়কুটা ইত্যাদি কিছুটা জমিতে রেখে দিলেও তা পঁচে মাটির জৈব পদার্থ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার জৈব সারের বর্ণনা দেয়া হলো:

খামারজাত সার

খামাজাত সার বাংলাদেশে সর্বাধিক ব্যবহৃত জৈব সার। খামাজাত সার সাধারণত গবাদি পশুর গোবর, গো-মূত্র, মুরগীর বিষ্ঠা, গোয়াল ঘরে ব্যবহৃত খড়কুটা, ফসলের অবশিষ্টাংশ, লতাপাতা, বাসা বাড়ির বর্জ্য, গো-খাদ্যের উচ্ছিষ্টাংশ ইত্যাদি গর্তের মধ্যে পঁচিয়ে এ সার তৈরী করা হয়। এদেশে গোবরের একটি বড় অংশ জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জৈব সার হিসেবে এদেশে খামাজাত সারের পরের অবস্থানে রয়েছে মুরগীর বিষ্ঠা সার। বিগত দুই দশকে এদেশে প্রচুর বানিজ্যিক মুরগীর খামার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব মুরগীর খামার থেকে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে মুরগীর বিষ্ঠা উৎপাদিত হচ্ছে, যা পঁচিয়ে জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, ফসল ক্ষেতে কখনও তাজা গোবর বা মুরগীর বিষ্ঠা প্রয়োগ করা উচিত নয়। কারন তাজা গোবর পঁচনের সময় প্রচুর তাপ ও গ্যাস উৎপাদিত হয়, যা ফসলের জন্য ক্ষতিকর। এদেশে অজতের^R অবহেলায় প্রচুরপরিমাণখামাজাত সার তৈরীর উপকরণ এবং এতে বিদ্যমান উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান নষ্ট হয়। খামারজাত সার চালায়ুক্ত গর্তে সংরক্ষণ করা উচিত এবং গর্তে যাতে অতিরিক্ত পানি না ঢুকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তবে এসার একবারে শুকনা অবস্থায় রাখাও ঠিক নয়, একটু ভিজা ভিজা রাখতে হবে। একবারে শুকিয়ে গেলে এতে বিদ্যমান নাইট্রোজেন গ্যাস হয়ে উড়ে যায়। গো-মূত্রে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন থাকে। তাই খামাজাত সারের সাথে গো-মূত্রও সংরক্ষণ করতে হবে। এতে সারের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।

কম্পোস্ট সার

ফসলের অবশিষ্টাংশ, লতাপাতা, আগাছা, কচুরীপানা, খাবারের উচ্ছিষ্টাংশ, বাসা বাড়ির বর্জ্য, নগর বর্জ্য ইত্যাদি একত্রে স্তুপআকারে জমা করে ও পঁচিয়ে এ সার তৈরী করা হয়। এসব দ্রব্য একটির উপর আরেকটি স্তরে স্তরে রাখতে হবে। এক একটি স্তর ১০-১২ ইঞ্চি পুরুত্বের হতে পারে। স্তুপের আকার সাধারণত ৩-৪ হাত চওড়া ও ৩ হাত পরিমাণ উঁচু হতে হবে। পঁচন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য স্তুপের মাঝামাঝি উচ্চতায় ১.৫-২.০ ইঞ্চি পুরু করে তাজা গোবরের স্তর দেয়া যেতে পারে। এছাড়া স্তুপকৃত দ্রব্যাদির সাথে অল্প কিছু ইউরিয়া ও টিএসপি সার মিশিয়ে দিলেও পঁচন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। স্তুপের উপরে কাদার প্রলেপ দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময় পর পর পানি স্প্রে করে স্তুপ ভিজা রাখতে হবে। সমানভাবে পঁচার জন্য দেড়-দুই মাস পর স্তুপটি উল্টে পাটে দিতে হবে। চার-পাঁচ মাসের মধ্যে স্তুপটি পঁচে কম্পোস্ট সার তৈরী হবে।

ফসলের পরিত্যক্ত অংশ

ফসল কর্তনের সময় ফসল গাছের যে অংশ ফেলে দেয়া হয় বা জমিতে রেখে আসা হয় তাকে ফসলের পরিত্যক্ত অংশ বলা হয়। সারা দেশে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে ফসলের এসব পরিত্যক্ত অংশ অযত্নে অবহেলায় নষ্ট হয়। অথচ এটি একটি মূল্যবান সার হতে পারে। এতে পচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ ও উদ্ভিদ পুষ্টি থাকে। অনেক সময় জমি পরিস্কার করার জন্য ফসলের এ পরিত্যক্ত অংশ ক্ষেতেই পুড়িয়ে ফেলা হয় অথবা অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়। ফসলের এ পরিত্যক্ত অংশের যথাযথ ব্যবহারে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। এ পরিত্যক্ত অংশ দিয়ে কম্পোস্ট সার তৈরী করা যেতে পারে। এছাড়া এসব খড়কুটা ফসল চাষের সময় জমিতে আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, যা পরবর্তীতে জমিতেই পঁচে জৈব পদার্থ যোগ হতে পারে।

ভার্মি-কম্পোস্ট (কৈচো সার)

কম্পোস্ট সার তৈরীতে কৈচো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কম্পোস্ট তৈরীর জৈব উপাদানসমূহ যেমন- ফসলের পরিত্যক্ত অংশ, লতাপাতা, আগাছা, কচুরীপানা, খাবারের উচ্ছিষ্টাংশ, বাসা বাড়ির বর্জ্য, গোবর/পশুপাখীর মল ইত্যাদি কৈচো খেয়ে কম্পোস্ট সারে রূপান্তরিত করতে পারে, যা কৈচো সার বা ভার্মি-কম্পোস্ট নামে পরিচিত। সাধারণ কম্পোস্টের তুলনায় ভার্মি-কম্পোস্ট অধিক পুষ্টিগুনসম্পন্ন। চাড়ি বা রিং এবং ট্যাংক পদ্ধতিতে ভার্মিকম্পোস্ট তৈরী করা যায়।

প্রথমে উদ্ভিজ্জ উপাদানগুলো টুকরা করে কাটতে হবে এবং উদ্ভিজ্জ ও প্রানীজ উপাদানগুলো ১০-১৫ দিন আলাদাভাবে পঁচাতে হবে এবং অতিরিক্ত আর্দ্রতা শুকাতে হবে। একটি খড়ের চালা বিশিষ্ট ঘরের মধ্যে ৪০ কেজি ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট একাধিক চাড়ি বা রিং বসাতে হবে অথবা ৮২ (লম্বা) x ৪২ (চওড়া) x ২২ (উঁচু) আকারের ট্যাংক তৈরী করতে হবে। ট্যাংকের তলায় ২-৩ ইঞ্চি পুরু করে করে ক্রমান্বয়ে ইটের খোয়া বা রাবিশ, বালু, দৌআশ মাটি ও খড়ের স্তর দিয়ে বেড তৈরী করতে হবে। পঁচানো ও শুকানো প্রানীজ ও উদ্ভিজ্জ উপাদানগুলো সমান অনুপাতে মিশিয়ে চাড়ি, রিং বা ট্যাংকে ভরতে হবে। উল্লেখ্য যে, প্রানীজ উপাদান যত বেশি ব্যবহার ব্যবহার করা হবে ভার্মিকম্পোস্টের গুনগত মান তত বৃদ্ধি পাবে। উপাদানগুলির উপর প্রতি ৪০ কেজি উপাদানের জন্য ২৫০ গ্রাম পূর্ণ বয়স্ক এসিনা ফেটিডা, ইউড্রিলাস ইউজিনি অথবা পেরিওনিয়া এক্সক্লাভেটাস প্রজাতির কৈচো ছড়িয়ে দিয়ে ছালার চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং হালকা পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। ২-৩ দিন পর পর উপাদানগুলি শুকিয়ে গেছে কিনা দেখতে হবে এবং শুকিয়ে গেলে হালকা পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। উপাদানগুলি যাতে বেশি ভিজে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রথম দিকে কম্পোস্ট তৈরী হতে ৬০-৭০ দিন সময় লাগে; তবে পরে মাত্র ৪০ দিনের মধ্যেই ভার্মিকম্পোস্ট তৈরী সম্পন্ন হবে। উপাদানগুলি যখন চা পাতির মত ঝুরঝুরে হবে এবং গাঢ় বাদামী রং ধারণ করবে তখন ভার্মিকম্পোস্ট তৈরী সম্পন্ন হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। কম্পোস্ট তৈরী সম্পন্ন হলে চালনীতে চলে কৈচো আলাদা করে কম্পোস্ট প্যাকেটজাত করতে হবে এবং তা ব্যবহার উপযোগি হবে। ভার্মি-কম্পোস্ট তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় কৈচোর প্রাপ্তিস্থানের একটি তালিকা পরিশিষ্ট-৫ এ দেয়া হয়েছে। উক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করে কৈচো সংগ্রহ করা যেতে পারে।

ট্রাইকো-কম্পোস্ট

ট্রাইকোডার্মা এক প্রকারের উপকারী ছত্রাক। এ ছত্রাক জৈব দ্রব্য দ্রুত পঁচাতে সাহায্য করে। তাই এ ছত্রাক ব্যবহার করে কম সময়কম্পোস্ট সার তৈরী করা যায় এবং এভাবে প্রস্তুতকৃত কম্পোস্ট সারকে ট্রাইকো-কম্পোস্ট সার বলে। এ সার প্রস্তুতের জন্য ১০ ফুট দৈর্ঘ্য, ৫ ফুট প্রশস্ত ও ৪.৫ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট একটি হাউস তৈরী করা যেতে পারে। কম্পোস্ট তৈরীর জৈব উপাদানসমূহ যেমন-ফসলের পরিত্যক্তঅংশ, লতাপাতা, আগাছা, কচুরীপানা, খাবারের উচ্ছিষ্টাংশ, বাসা বাড়ির বর্জ্য, গোবর ইত্যাদি এর সাথে ট্রাইকোডার্মা ছত্রাকের স্পোর সম্বলিত তরল দ্রব্য মিশিয়ে উক্ত হাউসের মধ্যে স্তুপ করে রেখে দিলে কম্পোস্ট সার প্রস্তুত হয়। সাধারণ কম্পোস্ট সার তৈরীতে যেখানে ৪-৫ মাস সময় লাগে সেখানে এ পদ্ধতিতে মাত্র ৩০-৩৫ দিনের মধ্যেই কম্পোস্ট তৈরী হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, কম্পোস্ট তৈরীর উপাদানগুলি যেন শুকিয়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। যদি শুকিয়ে যায় তবে পানি স্প্রে করে তা ভিজিয়ে দিতে হবে। স্তুপের তাপমাত্রা যদি খুব বেশি হয়ে যায় তবে স্তুপটি উলট পালট করে দিতে হবে। সার হিসেবে কাজ করা ছাড়াও ট্রাইকো-কম্পোস্ট ফসলকে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করে।

বায়ো-স্লারী সার

বায়ো-গ্যাস প্ল্যান্টে গোবর বা মুরগীর বিষ্ঠা থেকে বায়ো-গ্যাস উৎপাদনের সময় উপজাত হিসেবে বায়ো-স্লারী উৎপাদিত হয়। বায়ো-গ্যাস প্ল্যান্টের মধ্যে গোবর বা মুরগীর বিষ্ঠা অক্সিজেন বিহীন অবস্থায় পঁচিয়ে বায়ো-গ্যাস উৎপাদন করা হয়। গোবর বা মুরগীর বিষ্ঠা বায়ো-স্লারীতে রূপান্তরের ফলে তাদের মধ্যকার উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানের কোন কমতি হয় না। রোদ বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য বায়ো-স্লারীর গর্তের উপর চালা দিতে হয়; না হলে রোদ বৃষ্টিতে বায়ো-স্লারী সারের গুণগত মান হ্রাস পায়। বায়ো-স্লারী তরল অবস্থায় বা শুকিয়ে জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

সবুজ সার

জমিতে কোন বিশেষ ধরনের ফসল জন্মিয়ে সবুজ অবস্থায় একটি নির্দিষ্ট বয়সে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হলে তাকে সবুজ সার বলা হয়। দ্রুত বর্ধনশীল ডাল জাতীয় ফসল বা শূটি জাতীয় ফসল (**Leguminous crop**), অর্থাৎ যে সব গাছের শিকড়ে ব্যাকটেরিয়া গুটি তৈরী করে এবং বাতাসের নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে গুটিতে জমা করে সে সব ফসল সবুজ সার হিসেবে বেশি উপযোগি। কারন, এসব ফসলের মাধ্যমে মাটিতে জৈব পদার্থ যোগ হওয়া ছাড়াও বাড়তি নাইট্রোজেন যোগ হয়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। সবুজ সার হিসেবে খরিফ-১ মৌসুমে ধৈঞ্চা, বরবটি, মুগ কালাই, মাস কালাই ইত্যাদি ফসল চাষ করা যেতে পারে। তবে সবুজ সার হিসেবে এদেশে সাধারণত ধৈঞ্চা চাষ করা হয়ে থাকে। বৈশাখের শেষ সপ্তাহ থেকে জৈষ্ঠ্যের প্রথম সপ্তাহে ধৈঞ্চা বপন করে ৪০-৫০ দিন বয়সে তা চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই ধান রোপন করতে হবে। রোপা আমন ধানের পূর্বে সবুজ সার হিসেবে ধৈঞ্চা চাষ করা হলে এবং প্রতি শতাংশে কাঁচা ধৈঞ্চা গাছের ফলন ৪০-৬০ কেজি হলে রোপা আমন ধানের ইউরিয়া সারের মাত্রা শতকরা ২০-২৫ ভাগ কমাতে হবে; না কমালে ধান গাছের দৈহিক বৃদ্ধি বেশি হবে এবং হলে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে। এতে ধানের ফলন কমে যাবে।